দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... পৃষ্ঠা ...

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

পৃথিবীর অন্যতম মহৎ প্রাচীন পেশা হচ্ছে শিক্ষকতা। প্রাচীন সমাজ শিক্ষকদেরকে দার্শনিকের মর্যাদা দান করেছিল। চিন্তাশীল মানুষ মাত্রই দার্শনিক এবং শিক্ষক বলে স্বীকৃতি লাভ করতেন। তবে যেহেতু প্রাচীন এবং মধ্যযুগে শিক্ষা-দীক্ষার বিষয়গুলো শাসক পরিবারের মধ্যেই সীমিত ছিল, তাই শিক্ষকতা পেশাটিও রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্যের অতি উঁচু শ্রেণীতে অবস্থান করতো। সাধারণ মানুষ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ছিল। শিক্ষা এবং শিক্ষকদের সাথে তাদের সাক্ষাৎ পরিচয় তেমন একটা ঘটতো না। ইউরোপে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে রেনেসাঁস (পুনর্জাগরণ) ঘটলে শিক্ষার প্রসঙ্গটি গুরুত্ব পেতে শুরু করে। তবে সার্বজনীন শিক্ষার ধারণা সম্ভবত বৃটিশ লেখক টমাস মুরের (১৪৭৮-১৫৩৫ খ্রিঃ) utopia (১৫১৬ খ্রিঃ) গ্রন্থে সাম্যের সামাজিক অবস্থান থেকে প্রথম উপস্থাপিত হয়েছিল। ফরাসী দার্শনিক রুশো (১৭১২-১৭৭৮ খ্রিঃ) সাম্যনীতি দ্বারা পরিচালিত সমাজ চেয়েছিলেন। সে কারণে তিনিও মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষার অপরিহার্যতাকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন। বস্তুত ইউরোপে শিল্প বিপ্লব, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব– সমাজ, রাষ্ট্র এবং মানুষের চেতনার জগতে আমূল পরিবর্তন নিয়ে এসেছে।

আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার পত্তনের সাথে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তারলাভ স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়। বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই দেশে দেশে শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকারের বিষয় বলে স্বীকৃতিলাভ করে। নিরক্ষরতা দূরীকরণ রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান আন্দোলনে পরিণত হয়। এর ফলে শিক্ষার দ্বার খুলে যায় সমাজের সকল মানুষের জন্য। বিশ্ব পরিসরেও এক দেশ অন্য দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে, গড়ে উঠেছে অসংখ্য আন্তর্জাতিক সংস্থা। ১৯৪৬ সালে UNESCO গড়ে ওঠার পর পৃথিবীতে শিক্ষার আন্দোলন নতুন মাত্রা লাভ করেছে। শিক্ষার তাগিদ পরিমাণ এবং গুণগত দিক থেকে ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলছে। প্রতিটি দেশেই শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। সকল দেশেরই প্রায় অভিন্ন লক্ষ্য হচ্ছে নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করা। ফলে প্রতিটি দেশেই গড়ে উঠেছে নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ও শক্তি হচ্ছে শিক্ষক সমাজ। বিভিন্ন দেশে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ও অবস্থানের ব্যাপক তারতম্য থাকার পরও স্বীকার করতে হবে যে, বিংশ শতাব্দীতে সকল দেশেই অন্যতম বৃহৎ পেশা হিসেবে শিক্ষকতা গড়ে উঠেছে। শিক্ষক সমাজ স্তর ভেদে নিজ নিজ পরিচিতি নিয়ে সংগঠিত শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, গঠন করেছে বিভিন্ন সংগঠন। নিজেদের পেশাগত ও অর্থনৈতিক দাবি নিয়েও এ সব সংগঠন আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে। ইউনেস্কো বিশ্বব্যাপী শিক্ষকদের অবস্থানের ভিন্নতার কথা বিবেচনা করেই ১৯৬৬ সালের ৫ অক্টোবর প্যারিসে অনুষ্ঠিত 'The Special intergovernmental Conference on the Status of Teacher's শীর্ষক একটি দলিল অনুমোদন করে। এই দলিল বিশ্ব পরিসরে শিক্ষা ও শিক্ষকদের অবস্থান এবং মর্যাদাকে বিশেষভাবে স্বীকৃতি প্রদান করে– যা বিশ্বব্যাপী শিক্ষার সম্প্রসারণে একটি মাইল ফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ১৯৯৩ সালে ইউনেস্কো ৫ অক্টোবরকে 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। সেই থেকে ৫ অক্টোবরকে শিক্ষক সমাজ তাদের দিবস বলে পালন করতে শুরু করেছে। সারা বিশ্বে শিক্ষকের সংখ্যাও এখন কয়েক কোটিতে উন্নীত হয়েছে। বিশ্বের ছয়শত কোটি মানুষের শিক্ষা-দীক্ষার কাজে নিয়োজিত কয়েক কোটি শিক্ষক আজকের এই দিনে নিজ নিজ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা ও সম্ভাবনাকে গুরুত্বের সাথে উপলব্ধি করতে বসেছে। ইউনেস্কোও নিরন্তরভাবে বিশ্বব্যাপী শিক্ষার সমস্যার সমাধানকল্পে নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করে চলছে। ১৯৭৭ সালে ইউনেস্কো 'Recommendation Concerning the Status of Higher Education Teaching Personnel' নামে দ্বিতীয় দলিল গ্রহণ করে। ১৯৯৮ সালের ৯ নভেম্বর যথাক্রমে 'Declaration of Higher Education for the Twenty First Century: Vision and Action এবং Framework for Priority Action for Change and Development of Higher Education' নামে তৃতীয় ও চতুর্থ দলিল রচনা করে। এ সব দলিলের আলোকে বিশ্বব্যাপী শিক্ষক সমাজ নিজেদেরকে প্রস্তুত করছে, শিক্ষা ব্যবস্থাকে একবিংশ শতাব্দীর জন্য প্রস্তুত করার কাজে প্রেরণা পাচ্ছে। বাংলাদেশেও ছয় লক্ষাধিক শিক্ষক ইউনেস্কো কর্তৃক সুপারিশকৃত দলিল মোতাবেক যদি পেশাগত দায়িত্ব লাভ করার সুযোগ পায়, অথবা সেভাবে অবদান রাখার ক্ষেত্রে মেধা ও শ্রম নিয়োগ করে তা হলে আমার ধারণা আমাদের দীর্ঘদিনের অবহেলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি আমূল পরিবর্তন সাধিত হতে পারে, উন্নত বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি এবং দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার উপায় বের করা যেতে পারে।

আমাদের দেশে শিক্ষা নিয়ে অভাব-অভিযোগ, ভাবনা-চিন্তা ও দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। সাম্প্রতিক সময়ে দেশের নাগরিক সমাজ, শিক্ষিত মহল এবং সচেতন মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত মহল দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে হতাশা ব্যক্ত করছেন, নকল-দুর্নীতি এবং মানের অধঃগতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। এর কারণ হচ্ছে, দীর্ঘদিন থেকেই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কোন শিক্ষানীতি দ্বারা পরিচালিত হয়নি। ঐতিহাসিকভাবেই আমরা পেয়েছি একটি শিক্ষানীতিবিহীন শিক্ষা ব্যবস্থা। ফলে অনিয়ম, দুর্নীতি, বিশৃঙ্খলার মতো গর্হিত বিষয়গুলো আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অভ্যন্তরে ক্রমেই দানা বেঁধেছে, শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে ইউনেস্কোর দলিলে বর্ণিত ধারার প্রতি বিশ্বস্ততা রেখে দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

স্বীকার করতেই হবে যে, আমাদের দেশে শিক্ষা নিয়ে অভাব-অভিযোগ, ভাবনা-চিন্তা ও দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। সাম্প্রতিক সময়ে দেশের নাগরিক সমাজ, শিক্ষিত মহল এবং সচেতন মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত মহল দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে হতাশা ব্যক্ত করছেন, নকল-দুর্নীতি এবং মানের অধঃগতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। এর কারণ হচ্ছে, দীর্ঘদিন থেকেই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কোন শিক্ষানীতি দ্বারা পরিচালিত হয়নি। ঐতিহাসিকভাবেই আমরা পেয়েছি একটি শিক্ষানীতিবিহীন শিক্ষা ব্যবস্থা। ফলে অনিয়ম, দুর্নীতি, বিশৃঙ্খলার মতো গর্হিত বিষয়গুলো আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অভ্যন্তরে ক্রমেই দানা বেঁধেছে, শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে ইউনেস্কোর দলিলে বর্ণিত ধারার প্রতি বিশ্বস্ততা রেখে দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

এ মুহূর্তে দেশে ২০ হাজারের অধিক বেসরকারী কেজি স্কুল, ১৫,৯৪৪টি এবতেদায়ী মাদ্রাসা এবং ৫০ হাজারের অধিক এনজিও স্কুলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম চলছে। এ সব প্রতিষ্ঠান প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার চিরায়ত ধারণায় চলছে না। কেজি স্কুলগুলোর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক এনসিটিবির মতো জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত না হওয়ায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ধারণায় দেশের লক্ষ লক্ষ শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করা সম্ভব হচ্ছে না। অধিকন্তু প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এখনো শহরকেন্দ্রিক এবং অত্যন্ত ব্যয়বহুল। ফলে দেশের কোটি কোটি শিশু প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই শিশুরা শিক্ষা জীবনের শুরুতেই বৈষম্যের শিকার হচ্ছে অর্থাৎ এদেরকে কোন প্রকার পূর্ব প্রস্তুতি ব্যতীতই প্রাথমিক স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হতে হচ্ছে। অপরদিকে কেজি স্কুলগুলো শিশুদের ধারণ ক্ষমতাকে বিবেচনায় না এনে একগাদা বই-পুস্তক-খাতা পিঠের ওপর চাপিয়ে শিশুদের মধ্যে এক ধরনের শিক্ষা-ভীতি তৈরী করছে বলে মনে হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে কোন সুষ্ঠু নীতিমালা দ্বারা দেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার স্তর গড়ে ওঠেনি, চলছেও না। এগুলোর প্রতিষ্ঠায় মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে বাণিজ্যিকভাবেই লাভ করা। তাছাড়া শিক্ষক নিয়োগেও কোন নীতিমালা অনুসরণ করা হয় না। সবচাইতে বেশি ছাত্র বেতনধারী এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের বেতন সবচাইতে কম বলেও অভিযোগ আছে। দেশে প্রায় লক্ষাধিক শিক্ষক এখন বেসরকারী এসব কেজি স্কুলের সাথে জড়িত, অথচ তাদের কোন চাকরিবিধি নেই। ফলে শিক্ষকতাকে মহান পেশা হিসেবে অনেকেই এই স্তরে বেছে নিতে পাচ্ছেন না। চাকরিবিধির অনুপস্থিতি, স্বল্প বেতন ইত্যাদি কারণে শিক্ষকদের মধ্যে আয়ের দ্বিতীয় উৎস সন্ধানের প্রবণতা কাজ করে থাকে। ফলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য এখানেও ব্যাহত হচ্ছে।

দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকারী, বেসরকারী স্কুল, কেজি স্কুল এবং মাদ্রাসাই প্রধান ভূমিকা পালন করছে। কিছু এনজিও এবং বিশেষ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মিলিয়ে দেশে প্রাথমিক শিক্ষার সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৭০ হাজারের বেশী, এবং এগুলোতে প্রায় দুই লক্ষ শিক্ষক জড়িত আছেন। এক্ষেত্রেও বিরাজ করছে অসম ব্যবস্থা; সরকারী স্কুলসমূহে ব্যবস্থাপনার সংকট, যোগ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব রয়েছে। বেসরকারী রেজিস্ট্রেশনভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও সুষ্ঠু নীতিমালায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফলে দুর্নীতি এগুলোতে হাঁটু গেড়ে বসেছে, শিক্ষা যথাযথভাবে প্রবেশ করতে পারছে না।

এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোতেও বিরাজ করছে প্রায় একই সমস্যা। সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা এতসব ধারা-উপধারায় বিভক্ত হওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা থেকে আমাদের শিশুরা খুব কমই উপকৃত হতে পারছে। শিক্ষার প্রতি তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি, ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার প্রধান দু'টি স্তরই হচ্ছে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তর। এক্ষেত্রেই আমরা এ পর্যন্ত মানের অধঃগতি এবং বৈষম্যের দূরত্ব ব্যতীত আর বিশেষ কিছু অবদান রাখতে পারিনি।

আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষাতে বেসরকারী স্কুলের সংখ্যা ১৬ হাজার অতিক্রম করেছে, সরকারী স্কুলের সংখ্যা ৩১৭টিতেই স্থির রয়েছে। দেশে প্রায় ৪৮২৬টি দাখিল মাদ্রাসাসহ মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসায় এক লক্ষের অধিক শিক্ষক কর্মরত আছেন। সম্প্রতি দেশব্যাপী বেসরকারী শিক্ষকদের আন্দোলনের ফলে সরকার বেসরকারী শিক্ষকদের মূল বেতনের ৯০ শতাংশ সরকারী কোষাগার থেকে দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে। তারপরও সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে যথেষ্ট বৈষম্য বিরাজ করছে। এর ফলে দুই মানের শিক্ষা একই স্তরের শিক্ষায় বিরাজ করায় যথেষ্ট ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে।

দেশের কলেজ শিক্ষাতেও বিরাজ করছে চরম বিশৃঙ্খলা। সুষ্ঠু নীতিমালার অভাবে দেশে কলেজ প্রতিষ্ঠা, শিক্ষার মান, পাঠক্রম, শিক্ষক নিয়োগ, চাকরিবিধি ইত্যাদি কিছুই নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নামক একটি উচ্চতর প্রতিষ্ঠান যত্রতত্র অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু করে দেশে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এক ভয়াবহ সংকটের সৃষ্টি করেছে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলোর মধ্যে দূরত্ব এও প্রতিযোগিতা তৈরি হচ্ছে।

দেশে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কলেজ এবং মাদ্রাসা শিক্ষাক্ষেত্রে কতগুলো মৌলিক দুর্বলতা দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছে। এ মুহূর্তে এগুলো দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে গ্রাস করতে বসেছে। শিক্ষা বোর্ড, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, মাদ্রাসা বোর্ড এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিচালিত এসব প্রতিষ্ঠান লাগামহীনভাবে দুর্নীতি বিস্তারে ভূমিকা রাখছে; দুর্নীতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন দান, বেতন-ভাতা দেওয়া, সার্টিফিকেট প্রদান, সরকারী শিক্ষকদের বদলি করা ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেছে। এ নিয়ে দীর্ঘদিন থেকে সমালোচনা থাকলেও কার্যতঃ কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না। দেশের স্বায়ত্তশাসিত সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর লেখাপড়ার মানও বর্তমানে বিশ্বমানের চাইতে বেশ নিচে অবস্থান করছে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে অবস্থান করছে। তাছাড়া এগুলোর মধ্যে দু'একটি ব্যতীত অধিকাংশই এখনো বিশ্ববিদ্যালয় ধারণাকে যথাযথভাবে ধারণ করতে পারেনি। সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, আমাদের দেশে উচ্চতর শিক্ষা এখনো আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমুখী হয়ে ওঠেনি; গবেষণা এবং প্রায়োগিক চিন্তা-ভাবনাও এগুলোতে যথাযথভাবে কার্যকর নেই। এখনো উচ্চতর শিক্ষা সার্টিফিকেট অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে।

তিন স্তর বিশিষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থাটি হবে : ১. প্রাথমিক স্তর : বর্তমান পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা স্তরটি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বৃদ্ধি করার সুপারিশ করা হয়েছে। ২০০৩ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরের মেয়াদ ছয় বছর এবং ২০১০ সালের মধ্যে তা ৮ বছর পূর্ণ করা হবে। এ স্তরে শিক্ষার বিষয়সমূহ হবে মাতৃভাষা, গণিত, পরিবেশ পরিচিত সমাজ ও বিজ্ঞান, চারু ও কারুকলা, শারীরিক শিক্ষা, সঙ্গীত। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইংরেজি অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে পড়ানো হবে। তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজি, ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার প্রাথমিক স্তরকেও সমন্বিত পাঠ্যসূচী অনুসরণের মাধ্যমে ৮ বছর মেয়াদী করার সুপারিশ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দাখিল স্তর না রেখে আলিম চার বছর, ফাজিল তিন অথবা ৪ বছর এবং কামিল এক ও দুই বছর।

২. মাধ্যমিক স্তর : বর্তমান মাধ্যমিক স্তরকে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারিত করে নতুনভাবে মাধ্যমিক স্তর হিসেবে বিবেচনার সুপারিশ করা হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে তিনটি ধারা থাকবে : (ক) সাধারণ শিক্ষা, (খ) মাদ্রাসা শিক্ষা ও (গ) কারিগরি শিক্ষা। তবে সব ধারাতেই বৃত্তিমূলক শিক্ষা বাধ্যতামূলক থাকবে। মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে এবতেদায়ী শেষ করে নবম শ্রেণী, আলেম শেষ করে ডিগ্রী পর্যায়ে ভর্তি হওয়া যাবে। দ্বাদশ শ্রেণী শেষে অনুষ্ঠিত পাবলিক পরীক্ষায় গ্রেডিং পদ্ধতিতে পরীক্ষার মূল্যায়ন করা হবে।

৩. উচ্চ শিক্ষা : বিশ্ববিদ্যালয় এবং নির্দিষ্ট কলেজে চার এবং অন্যান্য কলেজে চার ও তিন বছর মেয়াদী ডিগ্রী কোর্স চালু করা হবে। তবে সকল ক্ষেত্রেই ১০০ নম্বর ইংরেজি ভাষা বাধ্যতামূলক থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চার বছরের সমন্বিত অনার্স এবং এক বছরের মাস্টার্স কোর্স সুপারিশ করা হয়েছে। তিন বছরের ডিগ্রী গ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা দুই বছরের মাস্টার্স কোর্সে অধ্যয়ন করতে পারবে। কলেজ পর্যায়ে চার বছরের অনার্স কোর্স চালু করারও সুপারিশ করা হয়েছে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বৃত্তি ও সহজশর্তে ঋণ দেওয়ার সুপারিশ রয়েছে। বাণিজ্যিক এবং সাম্প্রদায়িক পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুমতি না দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। ২০০০ সালে বিশ্বশিক্ষক দিবসের প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিকে একটি শিক্ষানীতি উপহার দিয়েছেন। এজন্য সমস্ত শিক্ষক সমাজ এবং সচেতন মহলের পক্ষ থেকে সরকারকে ধন্যবাদ দেওয়া যেতে পারে। তবে এখন গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা। জনগণকে সাথে নেওয়া গেলে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা সম্ভব। ■